বাংলা সংস্কৃতি: চাই আর একটি ভাষা-বিপ্লব -২

যুবায়ের হাসান

আগের সংখ্যাটি দেখতে হলে এখানে টোকা মারুন

মূল বাংলার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বাংলার বাইরে এই যে ছোট ছোট বাংলা এদের দিকে তাকানো যাক। আসাম ছিল জঙ্গলময় নদী-বিধৌত এক উর্বর ভূ-খন্ড। নিম্ন-আসাম বা লোয়ার আসামের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলই ছিল প্রায় জনবসতি শূন্য । একশো থেকে দেড়শো বছর আগে জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ববাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক এ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে তোলে এবং প্রশাসনের চাহিদামাফিক ধান, পাট প্রভৃতির চাষাবাদ শুরু করে। এই অভিবাসনের পিছনে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা থাকা সত্বেও নীতির প্রশ্নে এদের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়। তাই তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসক হান্টার সাহেবই আবার বলেন:

> পূর্ব বাংলার বাঙালির মুসলমানরা যেখানেই একখন্ড জমি দেখতে পায়, সেখানেই ক্ষুধার্ত শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লাখ লাখ গরিব, ছিন্নমূল বাঙ্গালি চাষী লোয়ার আসাম দখল করে নিচ্ছে।
>
> (সূত্র : দি ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড)

অনুন্নত আসামের উন্নয়নের লক্ষ্যেই হোক বা অন্য কোন দূরভিসন্ধি হাসিল করার লক্ষ্যেই হোক, ১৯১১ সালে বাংলা থেকে বৃহত্তর সিলেট ও গোয়ালপাড়া জেলা দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। খুব স্বাভাবিক কারণেই এ প্রদেশে বাঙ্গালির সংখ্যা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ১৯৩১ সালের সরকারী জনগণনা অনুসারে আসামে অসমিয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লাখ আর বাঙ্গালির সংখ্যা ৪০ লাখ।

এ সময় ইংরেজ শাসকদের নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে এবং অত্র অঞ্চলে ক্ষমতা নিরংকুশ করতে অসমিয়া জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো হয়। কুখ্যাত ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি তত্ত্বের অনুসরণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করা হয়। অসমিয়ারা বাঙ্গালিদের উদ্দেশ্যে গালি দিয়ে বলত:

> ‘আলি-কুলি বাঙ্গালি
> কুকুরের পোয়ালি
> কোর পরা আহিলি?’

মূলত: ১৯৩৫, ১৯৬১ ও ১৯৮১ সালে সারা আসাম জুড়ে বড় বড় বাঙ্গালি নিধন অভিযান সংঘটিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর প্রশাসকরাও বিদেশী প্রভুদের নীতি অনুসরণ করে। এসব দাঙ্গায় কমপক্ষে দশ হাজার বাঙ্গালি বিশেষত: বাঙালি মুসলমান প্রাণ হারায়, লাখ লাখ মানুষ বাড়িঘর হারিয়ে ছিন্নমূল হয় অথবা নাগরিকত্বসহ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় প্রায় উদ্বাস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

১৯৬১ সালে ভারতের প্রথম সরকারী জনগণনায় দেখা গেল, অথবা বলা যায়, দেখানো হল যে, অসমিয়াদের সংখ্যা বাঙ্গালিদের তিনগুণ। তৎকালীন সেনসাস কমিশনের সুপারিনটেন্ডেন্ট তাই বিস্ময়ের সাথে তার রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, "ইট ইজ আ বায়োলজিক্যাল মিরাকল।" কিন্তু এর নেপথ্যে মূল সত্যটি হল এই যে, উগ্র প্রাণসংহারী অসমিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে প্রাণ রক্ষার তাগিদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লাখ লাখ বাংলাভাষী নিজেদের অসমিয়া হিসাবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয় এবং ১৯৬১ সালের এক সরকারী কালাকানুনে এরা মাতৃভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে, আসামের একমাত্র প্রশাসনিক ভাষা অসমিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শুধু ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দেয় দক্ষিণ পূর্ব আসামের পাহাড় ঘেরা বরাক উপত্যকা। প্রায় সম্পুর্ণভাবে বাঙ্গালি অধ্যুষিত বৃহত্তর কাছাড় জেলাবাসীর মনে উক্ত ভাষাগ্রাসী কালাকানুনের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে, ১৯৬১ সালেরই ১৯শে মে জেলাশহর শিলচরে এগারো জন তরুণ-তরুণী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এরপর, এই ভাষা আন্দোলন শতগুণে স্ফূরিত হয়। উপায় না দেখে, আসাম সরকার শুধুমাত্র বরাক উপত্যকার মানুষদের জন্য বাংলা ভাষার স্বীকৃত দেয়। কিন্তু এতেও আছে শুভংকরের ফাঁকি। বাংলায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও চাকরি লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফল ঘটেনা---অসমিয়াকরণ চলছে নীরবে ও সরবে, সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে । নিরূপায় হয়ে কাছাড়বাসী বাঙ্গালী আজ আলাদা রাজ্যের দাবী তুলেছে।

বিহার, উড়িষ্যার বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অবস্থাও প্রায় আসামের মতো করুণ। সরকারীভাবে রাজ্যপর্যায়ে মূল ও স্থানীয় ভাষাটি প্রতিষ্ঠিত থাকায় সেখানে বাংলা ভাষার কোন বিকাশ হয়নি। ভাগলপুর, কাটিহার, বালেশ্বর, কটক এলাকার লাখ লাখ বাঙ্গালির জীবনে তাই দুর্ভোগ নেমে এসেছে। এদের বর্তমান প্রজন্ম হয় হিন্দি, নতুবা উড়িয়া ভাষায় লেখাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছে।

অধুনা উপজাতি অধ্যুষিত নতুন রাজ্য ঝাড়খন্ডে বাঙ্গালিকে একই পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। সে রাজ্যে বাঙ্গালি জাতিগতভাবে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বাংলা ভাষাকে এ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের সহযোগিতার অভাবে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলো ক্রমেই হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

ছত্রিশগড় রাজ্যের 'দন্ডকারণ্য' নামের অরণ্যে বা একসময়ের কালা-পানির দেশ 'আন্দামান'-এর দূর্গম দ্বীপমালায় কিংবা গুজরাটের মরুভূমি অঞ্চলে ভারতের স্বাধীনতার পর বহু লাখ বাঙ্গালি শরণার্থীকে পুনর্বাসনের নামে যে অমানবিক দন্ড দেওয়া হয়েছিল তা সব বিচারেই নজিরবিহীন। এই দেশত্যাগী লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীটি শেষপর্যন্ত একান্ত নিজের করে কোনো দেশের ঠিকানা খুঁজে পায়নি।

বাংলাদেশের সীমানার পূর্বদিকে, তৃতীয় বাংলা, অর্থাৎ, পাহাড়ি বাংলার শুরু। ত্রিপুরা এই পাহাড়ি বাংলার কেন্দ্রভূমি। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরাকে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা এখনো পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এবং রাজভাষা হিন্দির সমাদর উল্লেখ করার মতো।

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে, মায়ানমমারের আরাকান রাজ্য। বর্মী শাসকরা এখন এর নাম রেখেছে 'রাখাইন ফ্রি ষ্টেট'। দূর্গম পাহাড়-পর্বত, নদী জঙ্গলময় এ অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল জুড়ে প্রায় সাতশত মাইল প্রলম্বিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চট্টগ্রামের উপ-আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এবং এরা রোহিঙ্গা মুসলমান হিসাবে পরিচিত। সতেরো শতকে আরাকান রাজ্যসভায় বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। আলাওল ও দৌলত কাজী সে সময়কার বিখ্যাত রাজকবি হিসাবে সমাদৃত হয়েছিলেন।

বহু শতাব্দী বসবাসের পরও এই অঞ্চলের রোহিঙ্গা-বাঙ্গালিরা নাগরিক অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়নি। এদের অধিকাংশেরই ভোটাধিকার পর্যন্ত নেই। আরো মর্মান্তিক এই যে, এদের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে সর্বদা নিবন্ধীকৃত হতে হয় এবং নিজ গ্রামের বাইরে যাওয়াসহ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। বর্মী শাসকদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে আজো এরা টিকে আছে, তবে ১৯৪২,১৯৪৮,১৯৬৫,১৯৭৮ সালে এদের উপরে সবচেয়ে বড় বড় পীড়ন অভিযান চলে, শত শত গ্রাম নিচিহ্ন করে দেওয়া হয়, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়, বেশ কয়েকলাখ মানুষ দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়ে আছে।

এই হল বহি:বাংলায় বাঙ্গালি হিন্দু মুলমানদের বর্তমান অবস্থা। গত পঞ্চাশ বছরের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিক থেকে, বাংলাভাষীরা অন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে। অবিশ্বাস্য হলেও রূঢ় সত্য এই যে, এই সময়কালে প্রায় এক কোটির উপর বাংলাভাষী বা বাঙালিকে তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করতে হয়েছে এবং বর্তমানে আরো প্রায় পঞ্চাশ/ষাট লাখ বাংলাভাষী এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার কালো ছায়ার নীচে বসবাস করছে। বলাই বাহুল্য, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান দ্বীপমালা, আরাকান রাজ্যসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের অনাবাসী বা অভিবাসী বাঙ্গালী এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার শিকার। এমনকী, খোদ বাংলা হিসাবে পরিচিত ভূ-খন্ড পর্যন্ত এই বিপদের বাইরে নয় বলে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলা সংস্কৃতি-বিনাশী অনেক আলামত আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাঙ্গালিরা আজ বাংলাদেশকে বাংলা সংস্কৃতির আগামী পীঠস্থান বা ভরকেন্দ্র হিসাবে ভাবতে ভালবাসে। এভাবনার মধ্যে হয়তো কিছু বাস্তবতা আছে, কিন্তু সামগ্রীক বিচারে এর যথার্থতা এখনো প্রমাণিত হয়নি, অথচ এ কথাও সত্য যে, বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশকেই আজ দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে, শেষ পর্যন্ত এই ভাষার নামেই বাংলাদেশের নামকরণ ও স্বাধীন সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলা শিক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারী ভাষার মর্যাদাও পেয়েছে, কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে কি মহান মাতৃভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা গেছে? এর উত্তর না-ই হবে। অর্থ-বিত্তে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণীর স্ত রে সাংস্কৃতিক চেতনার দৈন্য প্রকট। আকাশ-নির্ভর সম্প্রচার সংস্কৃতির কু প্রভাবে, অবাধ তথ্য সংস্কৃতি বিকাশের অজুহাতে বাংলার মূল সংস্কৃতির কাঠামোতে আঘাত হানা হচ্ছে বার

বার। আঘাতটা হানছি আমরাই--- বাইরের কেউ নয়। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রকৌশল ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজো ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অবলীলায়। সবচেয়ে বিপদের বিষয় এই যে, ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন নামের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের পাশাপাশি ভুঁইফোড় অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গজিয়ে উঠছে। হাইটেক প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণের নামে সৃষ্টি হচ্ছে মাটি ও জনসংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন এক নতুন প্রজন্ম----সংকর এক প্রজাতি বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

চলবে - -

যুবায়ের হাসান, ঢাকা, ০১/০৩/২০০৭